মির্জা শাফশিকান এবং নুরুল্লাহ খান মির্জানগরের নওয়াব বাড়ি ও কিল্লা বাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। জে. ওয়েস্টল্যান্ড সর্ব প্রথম মির্জানগরের ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে লেখেন এবং ইমারতটিকে নওয়াব ও ফৌজদারদের বাসভবন হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর অনুসরণে এ. এইচ. দানী এবং অন্যান্যরা এটাকে সাধারণ বাসভবন হিসেবে উল্লেখ করেন। প্রত্নতাত্ত্বিক ও স্থপতিদের মতে স্থানীয়ভাবে নবাববাড়ি বা হাবসিখানা নামে পরিচিত স্থাপত্য কাঠামোটি প্রকৃতপক্ষে মোগল আমলের একটি হাম্মামখানা।

পরিদর্শনের সময়সূচি

গ্রীষ্মকালীন সময়সূচি

১ এপ্রিল থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর
মঙ্গল থেকে শনিবার
সকাল ১০:০০টা থেকে বিকাল ০৬:০০টা
সোমবার দুপুর ০২:০০টা থেকে
বিকাল ০৬:০০টা
রবিবার সাপ্তাহিক বন্ধ

শীতকালীন সময়সূচি

১ অক্টোবর থেকে ৩১ মার্চ
মঙ্গল থেকে শনিবার
সকাল ০৯:০০টা থেকে বিকাল ০৫:০০টা
সোমবার দুপুর ০১:৩০টা থেকে বিকাল ০৫:০০টা
রবিবার সাপ্তাহিক বন্ধ

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

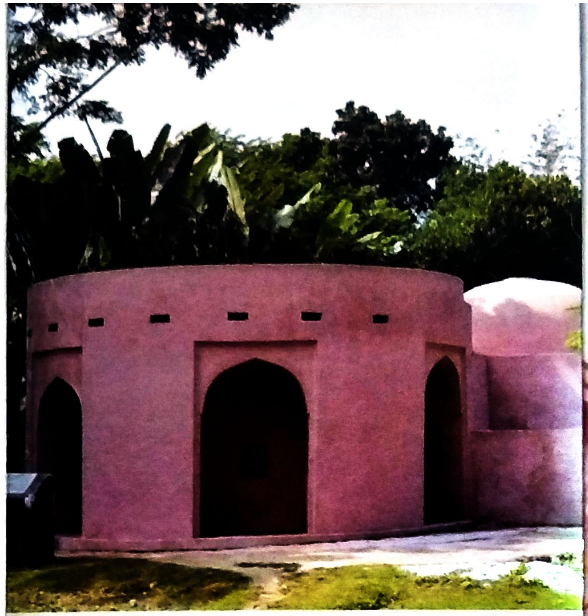

মির্জানগর হাম্মামখানা

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার মির্জানগর গ্রামে এই হাম্মামখানাটি অবস্থিত। এটি কপোতাক্ষ নদের দক্ষিণ তীরে মির্জানগর গ্রামে স্থানীয়ভাবে পরিচিত নওয়াব বাড়ী কমপ্লেক্স-এর অভ্যন্তরে টিকে থাকা একমাত্র স্থাপত্য নিদর্শন। পুরাকীর্তি সংলগ্ন একটি প্রাচীন নদীখাত রয়েছে। এ অঞ্চলের অতীত ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে এই নদীখাতটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলে ধারণা করা হয়। জেমস রেনেলের মানচিত্রে (১৭৮১খ্রি.) যশোরের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসেবে মির্জানগরকে দেখানো হয়েছে। জনশ্রুতি অনুযায়ী দুইজন মোগল ফৌজদার, মির্জা শাফশিকান এবং নূরুল্লাহ খান, এখানে তাঁদের প্রশাসনিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সে সময়ে এ অঞ্চল প্রসিদ্ধি অর্জন করে।

হাম্মাম ফার্সি শব্দ, যার অর্থ গোসল করার স্থান। হাম্মাম বা hu-mam এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ hammam-hu-mamheat বা তাপ। অন্য এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, at-hamim থেকে এর উৎপত্তি - যার অর্থ 'গ্রীষ্মের তাপ'। মধ্য এশিয়ায় সাধারণভাবে হাম্মাম শব্দটি ব্যাপকভাবে 'গোসলখানা' অর্থেই ব্যবহৃত হতো। বাংলার মধ্যযুগের স্থাপত্যের মধ্যে হাম্মাম বিশেষ এক বৈশিষ্ট্য বয়ে এনেছিল। স্থাপত্যিক সৌকর্যে ও মুসলিম রাজসিক ঐতিহ্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বাংলায় হাম্মাম স্থাপত্যের বিকাশ ঘটেছে মধ্যযুগের শেষভাগে। মধ্যযুগের বাংলার সমাজ কাঠামো এবং সংস্কৃতিতে স্থাপত্য হিসেবে হাম্মামখানা একটি নতুন ও অভিনব সংযোজন। স্থাপত্যবিদ্যার ক্ষেত্রে এই ধরনের গোসলখানা বা ইমারত নতুন ধারণার জন্ম দিয়েছে।

গোলাকার কূপের বাইরের দিকের খিলানযুক্ত কক্ষ

মির্জানগর হাম্মামখানার ছাদের গম্বুজ

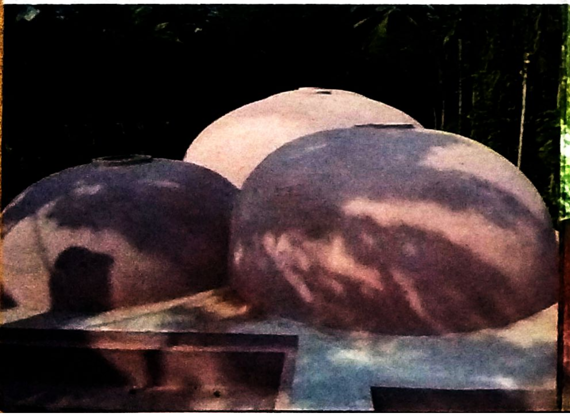

মির্জানগর হাম্মামখানা অভ্যন্তরের খিলান

বাংলাদেশে প্রাপ্ত হাম্মামসমূহের মধ্যে নির্মাণশৈলী এবং স্থাপত্যিক কৌশলে প্রায় একই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সাধারণত রাজকীয় ইমারতের সঙ্গেই হাম্মামখানা নির্মিত হতো। সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে কোনো হাম্মাম নির্মিত হয়নি।

মির্জানগর হাম্মামখানা স্থাপনাটি পরিকল্পনায় আয়তাকার। স্থাপত্যটি নির্মাণে চুন সুরকি ও ইট ব্যবহার করা হয়েছে। ইটের আকৃতি বর্গাকার। বন্ডিং ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে চুন সুরকি। চার গম্বুজ বিশিষ্ট ইমারতের অভ্যন্তরে রয়েছে চারটি খোলা কক্ষ এবং চুন-সুরকির তৈরি বৃহৎ কূপ।

মির্জানগর হাম্মামখানার প্রবেশ পথ, দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হতে

একমাত্র প্রবেশপথটি পশ্চিম দেয়ালে অবস্থিত এবং এর সঙ্গে সংযুক্ত ১৭ ফুট ৩ ইঞ্চি মাপের বর্গাকৃতির কক্ষটি সম্ভবত প্রসাধন কক্ষ (সভাকক্ষ বা উষ্ণ কক্ষও হতে পারে)। কক্ষের চার পাশের প্রত্যেক দেয়ালে রয়েছে একটি করে কুলুঙ্গি। প্রসাধন কক্ষ থেকে খিলানযুক্ত ধনুকাকার পথ দিয়ে সোজা আরেকটি বর্গাকৃতি কক্ষে প্রবেশ করা যায়। কক্ষটি পোশাক বদলানোর কাজে ব্যবহার করা হতো। এর উত্তর কোণে রয়েছে একটি ছোট জলাধার বা ট্যাঙ্ক। এই কক্ষের পূর্বে রয়েছে দুইটি বর্ধিত গম্বুজাকৃতির কক্ষ ছিল যা সম্ভবত মূল গোসলখানা। কক্ষে কোনো বড় জানালা নেই। তবে কেবলমাত্র একটি ছোট অর্ধগোলাকার জানালা সদৃশ ফোকর (oeil-de-beuf or bulls-eye) দিয়ে আলো ঢোকার পথ করা হয়েছিল। এর বাইরে পূর্ব পাশের গোলাকার কূপ সম্ভবত জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। গোলাকার কূপের চারপাশে চারটি খোলা কক্ষ রয়েছে। জলাধারে পানি ধরে

হাম্মামখানার অভ্যন্তরের খিলান পথ ও সিঁড়ি

মির্জানগর হাম্মামখানা, পূর্ব দিক হতে

মির্জানগর হাম্মামখানা অভ্যন্তরের খিলান ও স্কুইঞ্চ

রেখে সেখান থেকে মাটির পাইপের মাধ্যমে ভেতরের গোসলখানার চৌবাচ্চায় পানি সরবরাহ করা হতো। সম্পূর্ণ হাম্মামখানাটির মাঝ বরাবর রয়েছে একটি পানি গরম করার চুল্লি যা মাটির নীচ থেকে একটি টানা পাইপ (hypocaust-heat from bellow) দ্বারা সংযুক্ত। ধ্বংস প্রাপ্ত স্থাপত্যটির চারটি দেয়ালের বর্হিভাগ ভাঙ্গা ছিল। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংস্কার-সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে হাম্মামখানাটিকে পূর্বের আদলে ফিরিয়ে আনার কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে। ১৯৮০ সালে হাম্মামখানাটিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত একটি পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

মির্জানগর হাম্মামখানার গম্বুজের উপরে আলো প্রবেশের পথ